

ফি দাড়ি জরিপানা

Arju Ahmad

2019-11-19 12:51:34 +0600 +0600

7 MIN READ

'ফি দাড়ি জরিপানা আড়াই টাকা হয়
সেইজন্য শরাঅলা বড় খ্যালা হয়।'

শরাঅলা মানে হচ্ছে, শরীয়াতওয়ালারা। সাজন গাজীর এই গীতটা হলো সেই সময়কার কথা, যখন বাঙলার মুসলমানদের ধর্মকর্মের উপর হিন্দু জমিদারেরা করারোপ করে। যে মুসলমান দাড়ি রাখবে তাকে আড়াইটাকা করে বছরান্তে কর দিতে হবে।

মুসলমানদের থেকে ইসলামকে বিদূরিত করতে হিন্দুত্ববাদী নাম রাখতে বাধ্য করা হয়। মুসলিম নাম রাখা নিষিদ্ধ করা হয়। মসজিদের উপরও করারোপ করা হয়। সাত নাম্বার আইন অনুযায়ী এই কর প্রদান করতে প্রজারা অস্বীকার করলে তা ছিল বিদ্রোহের শামিল এবং দণ্ডযোগ্য।

এইসব ঘটনায় দ্বীনদার মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। কিন্তু নির্যাতিত মুসলমানদের পক্ষে তা মোকাবিলা করা ছিল অসম্ভবপর। ফলে তাতী, জেলে, কৃষকরাও এই দাড়ি কর দিতে বাধ্য হচ্ছিলেন।

১৮৩১ সালের জুন মাসে পুঁড়ার দুই সহোদর ভাই দায়েম আর কায়েম কোনও কারণে কাচারিতে গেলে জমিদার কৃষ্ণদেব রায় তাদের দাড়ি দেখতে পেয়ে দাড়িকর আদায় করেন।

আড়াই টাকার পরিমাণ নেহাত কম নয়। সেকালের বাজারদরের হিসেবে তা ছিল প্রায় দুই (০২) গ্রাম স্বর্ণের দরের সমান। এমনতেই পুজায় মুসলমানদের কর দিতে হত। তদুপরি এটা ছিল মরার উপর খড়ার ঘা এর মত।

সেসময় একবার সরফরাজপুরের বলাই জোলায় বাড়িতে একটা মাহফিলের আয়োজন হয়। এতে ৩০ জন আলেম একত্রিত হবার খবর পেয়ে জমিদার দাড়িকর সংগ্রহের অভিযান চালায়।

সেখানে উপস্থিত ছিলেন হজ্জফেরত তরুণ আলেম, হাফেজে কোরআন সাইয়্যিদ মীর নিসার আলী তিতুমীর। জমিদারের পেয়াদারা কর আদায়ে জোর করতে চাইলে মুসলমানরা তা প্রতিহত করেন।

জমিদার কৃষ্ণদেব এবং তার আমলা হরিনারায়ণ বসু এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে ৩০০ জন লাঠিয়ালসহ অভিযান চালান। লুটপাট করেন এবং বেহার গাজী ও জান মুহম্মদ মসজিদ দুটোকে পুড়িয়ে দেন।

১২৩৭ বঙ্গাব্দের দূসরা আষাঢ় এই ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় মুসলমানরা প্রথমে আইনের আশ্রয় নিলেন। বসিরহাট থানায় দায়েম কারিগর গং বাদী হয়ে জমিদার কৃষ্ণদেব গং এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। দারোগা রামরাম চক্রবর্তী মামলার আইও নিযুক্ত হন।

তিনি জমিদারের পক্ষাবলম্বন তো করেনই বরং উল্টো মুসলমানদের দায়ী করেন, প্রতিবেদনে বলেন জমিদার বদনাম করতে এবং শৃঙ্খলা ভঙ্গ করতে তিতুমীরের অনুসারী মুসলমানরাই এই কাণ্ড ঘটিয়েছে।

১২ ই আগস্ট মুসলমানদের পক্ষ থেকে বারাসাতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিরপেক্ষ সাক্ষী গ্রহণের আপিল করা হয়। ৭

দিন পর ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজেন্ডারের কোর্টে ১৯ আগস্ট থেকে নিরপেক্ষ সাক্ষী গ্রহণ শুরু হয়।

সাক্ষী সর্বজনাব সুনেশ সর্দার, দানেশ গায়েন, সুন্দর বণিক, প্রাণ গাজী বললেন যে অগ্নিকাণ্ডের কাজ জমিদারেরই।

শুনানি শেষে রায়ে ম্যাজিস্ট্রেট জমিদারের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ না নিয়ে উভয়পক্ষকে পঞ্চাশ টাকার বন্ডে বিবাদে না জড়ানোর নির্দেশ দিলেন।

এই অবিচারের ঘটনা মুসলমানরা মেনে নেন নাই। তারা আপিল করেন। মামলার অন্যতম বাদী কাদির বক্স রায়ে সত্যায়িত অনুলিপি চাইলেন। অনুলিপি দেওয়া হলো এমন সময় যখন হাইকোর্ট দুর্গাপূজার বন্ধে।

কোলকাতা থেকে মুসলমানরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন। মুসলমানদের যখন ডিভিশনাল কমিশনারের কাছে গেল তখন অফিশিয়াল ভিজিটের কথা বলে তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হলো।

এদিকে জমিদার সপ্তম আইন প্রয়োগ করে একের পর এক মুসলমানদের গ্রেফতার করছিলো এবং কারাগারে নির্যাতন করছিল।

* * *

তিতুমীর তখন বুঝতে পারলেন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ব্যতীত আর উপায় নেই। মাজলুম মুসলমানের পক্ষে এই বিচারব্যবস্থা কখনোই দাঁড়াবে না।

তিতুমীর ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলেন। নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। জমিদারদের লাঠিয়াল বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন।

নারিকেলবাড়িয়ার অবস্থাপন্ন কৃষক ময়েজউদ্দিন বিশ্বাসের জমিতে তিতুমীরের সেনাপতি গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে গড়ে তোলা হলো বাঁশের কেল্লা।

তিতুমীরের সেনাপতি গোলাম মাসুম ৫০০ যোদ্ধার একটা দল নিয়ে প্রথম অভিযান পরিচালনা করেন পুঁড়ার বাজারে। পুঁড়ার বাজার থেকে ইছামতী নদী পর্যন্ত বিজয় করলেন তারা।

পরের দিন ৭ নভেম্বর তারা লাউঘাটা বাজার আক্রমণ করেন। জমিদার পুত্র দেবনাথ রায় এবং গোলাম মাসুমের সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে দেবনাথ রায় নিহত হয়।

বিজিত অঞ্চলকে দারুল ইসলাম বলে ঘোষণা দেওয়া হলো। ক্রমশ তিতুমীরের অনুসারীর সংখ্যাও বাড়তে থাকলো। কদমগাছী, কলঙ্গ এবং বারাসাত এই তিন থানা সম্মিলিতভাবে তিতুমীরকে মোকাবিলার প্রস্তুতি নিল।

উপরন্তু জমিদার ও ইংরেজ নীলকরদের উপর্যুপরি চিঠিতে কলকাতা সরকার ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজেন্ডারকে নির্দেশ দিল ডিভিশনাল কমিশনারের সঙ্গে পরামর্শ করে সমূলে এই বিদ্রোহ দমন করতে।

১২৫ জনের গোলন্দাজ একটা বাহিনী নিয়ে আলেকজেন্ডার নারিকেলবাড়িয়া পৌঁছালেন। এটা ছিল ১৫ নভেম্বরের ঘটনা। কেল্লায় থাকা ৬০০ জনের একটি দল এতে বাঁধা দেয়। আলেকজেন্ডার কামান দাগাতে ও গুলি চালাতে নির্দেশ দিলে গোলাগুলিতে মাত্র একজন মুসলমান ব্যতীত কেউই সেদিন আহত হয় নি।

এই ঘটনায় সৈন্যরা ভয় পেয়ে পালাতে শুরু করে এমনকি খোদ আলেকজেন্ডারের দেহরক্ষীও পালিয়ে যায়। অগত্যা প্রাণভয়ে তিনিও ঘোড়া নিয়ে প্রাণপণে ছুটে এক মাইল দূরের এক নালায় পড়েন।

* * *

১৬ ও ১৭ তারিখ ইছামতীর দুই তীর ধরে বারাসাত ও নদীয়ার যে সারি সারি অসংখ্য নীল কুঠি ছিল তিতুমীর তার সব দখল করেন। জমিদারদেরও উচ্ছেদ করেন।

নীলকরদের সহযোগে রানাঘাটের জমিদার পাল চৌধুরী এবং নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট স্মিথের নেতৃত্বে তিতুমীরের সাথে হওয়া আরও একটি যুদ্ধে ইতোমধ্যে তিতুমীর বিজয় লাভ করেন।

আলেকজান্ডার এবং স্মিথের পরাজয়ে ডিভিশনাল কমিশনার বারলো উদ্বিগ্ন হলেন। দ্রুত পদক্ষেপ নিতে আলেকজান্ডারকে কোলকাতায় সরকারের কাছে প্রেরণ করলেন।

ইংরেজ সরকার মেজর স্কটের কমান্ডে ১১ পদাতিক রেজিমেন্ট, ক্যাপ্টেন সাদারল্যান্ডের নেতৃত্বে একটি ক্যাভেলরি ব্যাটালিয়ন এবং ল্যাফটেন্যান্ট ম্যাকডোনাল্ডের নেতৃত্বে এক কোম্পানি আর্টিলারি সমেত একটি পূর্ণাঙ্গ বাহিনী প্রেরণ করেন।

বিপুলসংখ্যক এই বাহিনীর সাথে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের একটা অংশও যোগ দেয়। তারা বাঁশেরকেল্লা আক্রমণ করেন। ঘণ্টাখানেক বীরবিক্রমে লড়াই হয়। কেবল লাঠি আর বল্লম দিয়ে ভারী অস্ত্রের সামনে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়। যুদ্ধে মুসলমানরা পরাজিত হয়। তিতুমীরসহ পঞ্চাশজন মুজাহিদ শহীদ হন।

ত্রিশজন আহত হয়। তিনজন মারা যায়। ইংরেজ সরকারের ১৭ জন নিহত হয়। প্রহসনের বিচার হয়। যেই বিচার না পাওয়ায় অস্ত্র ধরতে হয়েছিল সেই বিচার। ১৯৭ জন অভিযুক্তের মধ্যে বাঙলার শ্রেষ্ঠতম বীর গোলাম মাসুমকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

তিতুমীরের একুশ বছরের ছেলে তোরাব আলীকে কারাদন্ড দেয়া হয়। ছোট ছেলে গওহর আলী যুদ্ধে এক পা হারান। এছাড়াও ১৯৭ জনের মধ্যে বিভিন্ন জনের কারাদণ্ডাদেশের মেয়াদ ছিল

ফাঁসি- ১ জন

যাবজ্জীবন - ২১ জন

৭ বছর - ০৯ জন

৬ বছর - ০৯ জন

৫ বছর - ১৬ জন

৩ বছর - ৩৪ জন

২ বছর - ২২ জন

নির্দোষ - ৪৯ জন

দোষী সাব্যস্ত করেও দণ্ডমুক্তি পায়- ০৩ জন।

কেল্লার ভেতরে যুদ্ধরত ফটিক পাঠক নামের এক হিন্দু সাধুকে মানসিক ভারসাম্যহীন দেখিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়।

* * *

এই কথা স্মরণ রাখতে হবে, তিতুমীরই ছিলেন আমাদের ব্রিটিশ বিরোধী জিহাদে প্রথম শহীদ। তিনিই বীজ বপন করেছিলেন ১৮৫৭ এর বিদ্রোহের। তিনি কৃষকের হকের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁতীর হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। সাধারণ মুসলমানের হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

সাইয়েদ মীর নেসার আলী তিতুমীর ছিলেন হাফেজে কোরআন, আলেম ও মুফতি এবং পীর। খানকাহ করেছেন, মাদ্রাসায় পড়েছেন ও পড়িয়েছেন। মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। প্রয়োজনে অস্ত্র হাতে নিয়ে জান দিয়ে শহীদ হয়েছেন।

তিনি সেদিন ব্যর্থ হয়েছিলেন এটা ভাবলে ভুল হবে বরং তিনি স্বাধীনতার বীজ বপন করেছিলেন। দুর্ভাগ্য আজ তাঁর সেই মৃত্যুর দিনে রাষ্ট্রপক্ষ থেকে কোনও উদ্যোগ নেই। উদ্যোগ নেই আমাদের তরফেও। গণমাধ্যমেও তিনি অনুপস্থিত।

যে জাতির জাতীয় বীরের তালিকায় তিতুমীর আছেন সে জাতি কখনো জুলুমের সামনে নত হয় না। তিতুমীর এইভাবেই সমস্ত সংগ্রামে প্রেরণা হিসেবে ছিলেন। রহিমাহুল্লাহ।

তিতুমীরের সেই সংগ্রামে নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু উচ্চবর্ণের গাত্রদাহের কারণ ছিলেন তিনি।

শহীদ তিতুমীরকে নিয়েও ষড়যন্ত্র থেমে নেই, তাঁর প্রথম জীবনীকার বিহারি লাল সরকার থেকে শুরু করে ইদানীংকার অধ্যাপক রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত হেন মিথ্যাচার নেই যা তিতুমীরকে নিয়ে বই লিখে রুদ্রপ্রতাপ করেন নি।

রুদ্রপ্রতাপ বাবরি মসজিদ ভাঙার পক্ষের প্রচারণার লোক, বিজেপির আদর্শের। তিতুমীরের সংগ্রামের ইতিহাসও শুরু হয়েছিল মসজিদ ভাঙা এবং হিন্দুত্ববাদের মোকাবিলার মধ্য দিয়ে।

তাই সেই তিতুমীরকে ভিলেন করে তোলার যে হিন্দুত্ববাদী ভারতের প্রজেক্ট সে প্রজেক্টের অংশ হিসেবেই তিতুমীরের আলোচনাকে দূরে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে আর ভ্রান্ত ইতিহাসও একদিন ক্রমশ আমাদের গেলানো হবে।

সেই ভূত ঘাড়ে চাপার আগেই তিতুমীর আমাদের আলোচনায় আসুক, আসুক চেতনায়।